তিতিরের নৌকো যাত্রা

তমাল রায়

প্রতিটি আলো সরলরৈখিক গতিতে এসে মেশে এক অন্ধ বিন্দুতে।
প্রতিটি অন্ধবিন্দু বিচ্ছিন্নতায় পথ খুঁজে নিবে নিবে...
কখন যে আবার আলোর পথেই এসে দাঁড়ায় তা আজও বিস্ময়।

নইলে কেন এই প্রভূত দুর্যোগের মধ্যেও আলোর অপেক্ষায় ওরা। ওরা এক-এক করে পাঁচজন। পাহাড়ের বাঁকের মুখে ওদের এক বাড়িটা গথিক ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই পড়বে ডাইনিং হল। সেটা লম্বা চওড়ায় এক রীতিমতো হলঘর। ডাইনিং টেবিলের ওপরে রাখা গোল চাকতি মতো কি যেন। যার ক্যাসিনোর মতোই ঘোরার কথা, অথচ এখন স্থির। বাঁদিকের প্রথম ঘরটা প্রবীরের। মাঝবয়সী প্রবীরের ঘরের দুটি দেওয়াল জুড়ে শুধু বই। এঘরে ঢোকার ঠিক মাথায় লেখা 'ইনডাস'। পাশের ঘরটি 'রোমান'। ও ঘরে অনন্য থাকে। প্রবীরের স্ত্রী। তিতিরের মা। কেতাদুরস্ত কায়দায় সাজানো অনন্যার ঘর। অনন্যার টেবিলে রাখা একটি অর্কিড যা এখনও উজ্জ্বল। পাশে একটি বনসাই, কেন কে জানে। কোণের ঘরটা অরবিন্দর। এঘর থেকেই কখনো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত। অরবিন্দর ঘরের মাথায় লেখা 'গ্রীক'। অরবিন্দর ঘরের অ্যাটাচড বাথরুমে আছে ইয়া পেল্লাই এক বাথটব যেখানে এই বুড়ো বয়সেও দীর্ঘ সময় কাটে তার। আটবছরের তিতিরের কোনো ঘর নেই। ডাইনিং-এর এক কোণে পর্দার পার্টিশনে তার রিডিং -রাইটিং এবং অনিবার্য দুষ্টুমির ঘর। বিট্টু তিতিরের পোষ্য। ওর সাদা লোমে আঙুল চালিয়ে তিতিরের খুব মজা। বিট্টুরও। চুপ করে আদর খায়। ডাইনিং যেখানে বাইরের দরজায় মিশছে, ভেতরের দিকে মাথায়– ভগবান তথাগত। যদিও গত দিনদিন ধরে বৃষ্টি-বৃষ্টি-বৃষ্টি। আজ বিকেল থেকে তা বেড়েছে আরও। চারদিক ঝাপসা বিদুৎ চমকাল। আর সাথে সাথে বাজ– খব কাছেই পড়ল।

'জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য
মহৎ-মহৎ স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী...
তোমরা জাগ্রত থেকো।'

প্রবীর জাগ্রতই থাকে। তার ঘুম কমই পায়। এই পাহাড়ে এত রাত অবধি আলো কেবল তার ঘরেই জ্বলে। দেওয়ালজোড়া সারি সারি আলো। যা আদতে প্রজ্ঞার আলোই জ্বলায়, প্রবীর তা ওল্টায়। বাড়ির বাকিদের প্রতি অবশ্য প্রবীরের দায়িত্ব কম। ওর আগ্রহ দামি নদ, সিগারেট, আর বই। চিঠিও আসে, অনুরাগিণীর। তার চিঠি– প্রবীর পড়ে বটে, কিন্তু নাথিং সিরিয়াস। জীবন সম্বন্ধেও তার একই অভিমত। বেঁচে আছে। না থাকলেও কিছু যেত আসত না। অনন্য যে উল্টেদিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে তাতেও কি যায় আসে! প্রয়োজন হলে আছে নেপালি বস্তি। তিতির যে তারই সন্তান তা নিয়ে নিশ্চিত না হয়েও তো প্রবীর মেনে নিয়েছে। সকলের সাথেই থাকতে হয়। যাকে বলে পীসফুল কো-এক্সিসটেন্স। প্রতিবাদ করেই বা কী হয়। এই যে প্রবল ইন্ডাস সিভিলাইজেশন, যে সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল সর্বাধিক– ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল মতান্তরের সুমাত্রা, জাভা বোর্নিও পর্যন্ত– তাও তো ধ্বংস হয়ে গেছিল কিছু মানুষের ভুলে। নইলে যে নগর সভ্যতা, পাবলিক টয়লেট, বাথরুমের কথা ভাবতে পেরেছে, নৃত্য শিল্পকলার কথা ভেবেছে, মুদ্রার, শস্য সঞ্চয়ের কথা ভেবেছে, তারা বুঝতে পারেনি আগামি আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা! গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ যে তাদের ক্রমাগত দুর্বল করেছে বোঝেনি! না কি বুঝেও চুপ ছিল! যেমন প্রবীর চুপ এই সর্বগ্রাসী দুর্যোগ দেখেও। এখন প্রবীর জানলার পাসে...এই দিনমানেই যে রাত ঘনাল তা দেখে কই ভয় লাগছে না তো! ও চাইছে বরং বৃষ্টি আরও বাড়ুক। বৃষ্টি বাড়ছেও। শুরু হয়েছে প্রবল ঝড়। জানলা-দরজা কাঁপছে। বাইরে সাঁই সাঁই বাতাসের শব্দ। লাইন দিয়ে পিঁপড়েরা চলেছে দেওয়াল বেয়ে। কই ওদের তো ভয় করছে না! ক্ষুদ্রতম এই জীবকুল ও বেঁচে রয়েছে কত সহস্রবছর! শ্রম হয়তো বা কখনা মেধার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মুর্হুমুহু। খুব কাছেই বাজ পড়ল আবার কান চাপা দিল প্রবীরও! ঘরের দরজায় যিনি ঘুরে গেলেন তিনি অরবিন্দ। প্রবীরের বাবা।

'দুর্ভিক্ষ, মহামারী ছড়িয়ে পড়বে স্থানে স্থানে।
আকাশে ফুটে উঠবে ভয়ংকর সব লক্ষ চিহ্ন
তোমরা জাগ্রত থেকো'

এই পঁচাত্তরে কি ঘুম আর কিই-বা জেগে থাকা। একটু আগে টিভি-তে দেখাচ্ছিল এক আদিবাসী মহিলা বিধায়ককে দল বেধে পিটিয়েছে পুরুষ বিধায়করা মহিলাকে ধরে ধরে বার করেছেন তার সঙ্গী সাথীরা। মহিলাজাতের এতদিনেও কোনো উন্নতি হল না। পরনিন্দা-পরচর্চা-গসিপ-গল্প। যারা তার বাইরে তারা আবার স্বেচ্চাচারিতায় মগ্ন। স্ত্রী সরমাকে এ কারণেই পাত্তা দিত না অরবিন্দ। মেয়েমানুষের বুদ্ধি! প্রবীরকেও বারণ করেছিল পি. এইচডি করা মেয়েকে বিয়ে করো না বাবা, তাতে আখেরে তোমারই ক্ষতি। সে আমাদের মাথায় পা দিয়ে চলবে। অনন্যা অবশ্য ততটা করে না। নিজের ডিউটিটা ঠিকই করে। কিন্তু বড় চাপা। দশটা প্রশ্ন করলে একটা উত্তর। বোঝা যায় না মনের গতি। বোঝা তো গেলও না তিতির প্রবীরেরই ঔরসজাত কি না। তবে সন্দেহটা আছে, যায়নি। সেটা বোধহয় অনন্যাও আঁচ করে। ছেলেটারও মদ খাওয়া বেড়েছে। নেপালি বস্তিতে যাবার খবরও কানে আসে। এ বয়সের বাপের কথা আর কে শোনে! তবে পুরুষের এসব গুণ থাকলে মহিলারা একটু চাপে থাকে। অরবিন্দও তো যেত দেবাশিসবাবুর ছবিতে অভিনয় করা রাজেশ্বরীর কাছে। তা নিয়ে সরমার রাগ ছিল প্রবল। সরমা স্পর্শই করতে দিত না

শরীর। তারপর একটু শাড়িগয়না এনে দিলে আবার বশ। আসলে বশ কি আর তেমন করে কেউ হয়! ভাবো, ওই প্রবল গ্রীক সভ্যতার কথা। অ্যারিস্টটল, আর্কিমিডিস, সফোক্লিস, সক্রেটিস, প্লেটো...দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, আবার দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল সিফিলিস, গনোরিয়া। না, এডস তখন ছিল না। এথেন্সে আর স্পার্টার যুদ্ধ চলছে। আবার ম্যাসিডোনিয়ার উত্থান হচ্ছে। ভাঙা-গড়া-ভাঙা। যত রাজা তত মত, তত পথ। প্রথম গণতন্ত্রের সার্থক পীঠস্থান তো ছিল গ্রীস! কিন্তু চরম গণতন্ত্র কি ক্ষতি করে না সাম্রাজ্যের! অরবিন্দ বরং একনায়কতন্ত্রেই আস্থা রাখেন। হিটলার-স্তালিন-চেসেস্কু। লাগত তো প্রায়ই সমর আর প্রবীরের সাথে। বাড়ি ছেড়ে চলেও তো গেছিল প্রবীর। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। মা অসুস্থ। ফিরে এসো।' ফিরে এসেছিল। বাবার অসুস্থতার খবরে আসত বলে মনে হয় না। এ সবই অনেক আগের কথা। তখন প্রবীরের বিয়েই হয়নি। অরবিন্দর রক্তও ছিল গরম। এখন অবশ্য ভাঁটার টান, নইলে এই দুর্যোগে ভয় লাগছে কেন এত! প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথেই চমকে উঠছে সে। উঁকি মেরে দেখে আসছে প্রবীর । না, তিতিরকে নিয়ে অবশ্য অত মাথা ব্যথা নেই। কার না কার রক্ত। ও ঠিক জায়গা করে নেবে নিজের। যেমন করে নিয়েছে এ বাড়িতে। পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে জল নামছে তোড়ে। আরও বাড়ল বৃষ্টি। কেমন একটা অস্বস্তি। অজানিত ভয়! কয়েকটা পোকা ঢুকছে ঘরে। তাড়াতে হবে। ওরা হয়তো দুর্যোগের ভয়ে...হোক, এটা তো বাড়ি নয়। পোকা না পঙ্গপাল, আর ঢুকবে না তো? পঙ্গপালদের নেতা না থাকলেও তারা ছিল দলবদ্ধ। দলবদ্ধতা কখনো বুঝি নেতার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। অরবিন্দ পায়চারি করছেন একা। প্রবল হাওয়ায় দরজা ভাঙার উপক্রম। চেয়ার দুটোকে দরজায় সাঁটিয়ে দিল সে। অনন্যা কিছুটা বাঁকা দৃষ্টিতে অরবিন্দকে দেখে নিজের ঘরে ঢুকল। পর পর দুটো বাজ পড়ল। কানে আঙুল দিল অরবিন্দ।

ঘৃণিত হলে মহতী মানুষ।
তোমরা জেগে থেকো।'

জেগে থাকা অনন্যার কাছে ছিল এক সহজ অভিজ্ঞান। কিন্তু এখন যে বড় ঘুম পায়। চেষ্টা করে, কিন্তু পারে কই। প্রবল রোমান সাম্রাজ্যের মানুষদেরও জানা ছিল জেগে থাকার অভিজ্ঞান। যে প্রবল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য সমাদৃত ছিল সমস্ত বিশ্বজুড়ে তার কম তো কিছু ছিল না। থিয়েটার, জিমন্যাসিয়াম, খাদ্য সঞ্চয়ের জায়গা। নগরে বাস করত প্রায় সাড়ে তিনলাখ মানব-মানবী। ছিল লজিস্টিকও। বাইরে থেকে খাবার আসত, আসত দামি সুরা, এমনকি দামী মেয়েমানুষও। বেশ্যালয়ও ছিল। সেখানে প্রবীরের মতো মানুষরা যেত। আর ছিল গ্ল্যাডিয়েটর। যারা তাদের বীরত্বের প্রশংসা কুড়িয়ে নিত রাজকীয় পুরুষ এবং মহিলাদের থেকেও। নপুংসক স্বামীদের দুর্বলতা আড়াল করতে দায়িত্ব উঠত তো তাদেরই কাঁধে? আর ছিল কিউপিড। ভালোবাসার দেবতা। যাকে ভীষণ পছন্দ অনন্যার। ফল্গুধারার মতো নিরন্তর ধারাবাহিকতায় বয়ে যাওয়া ভালোবাসা যে বড় প্রিয়। বড় গোপন অনুরাগ অনন্যার। নইলে কেন এত কুকথা, কুব্যবহার সহ্যের পরও, একটা ফোন, শুধু একটা দূর সঞ্চারিত অরিজিৎ -এর ফোনের অপেক্ষায় প্রহর কাটে অভুক্ত অনন্যার। সে জানে তিতির প্রবীরের সন্তান কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে প্রবীরের ওর বাবার। কিন্তু সন্তানের মা তো জানে যে সে সন্তান কার। অনন্যা প্রবীরের ভুল ভাঙায়নি। কি লাভ? সন্দেহ তো এক সংক্রামক রোগ। যা কিনা সভ্যতারই সন্তান। প্রথম প্রথম মা বলত চলে আয় ওদের ছেড়ে। তোর আবার বিয়ে দেব। শিক্ষায়-দীক্ষায় আমার মেয়ে তো আর কম কিছু নয় কারও চেয়ে! অনন্যা যায়নি। কি লাভ! আরও একটা বন্ধনে জড়িয়ে তো যাওয়াই যায়। কিন্তু তারও যে ভালো হবে, ভালোবাসবে, তারই বা কি গ্যারান্টি? মা বলেছিল তাহলে অরিজিৎকেই বিয়ে কর। রাজি হয়নি। সব সম্পর্ককেই বাঁধা গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসতে হয়? এক বিছানায় না শুলে, এক সাথে রাত্রিযাপন না করলে কি আর মানুষকে সম্পূর্ণ চেনা যায়। চেনা যায়? পুরুষদের! 'পুরষত্ব'-র বড় অভাব মা এ পোড়া পৃথিবীতে। নইলে অতবড় রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যায়! পুরুষরা হয়ে পড়েছিল দুর্বল, অলস, কর্মবিমুখ, রতিপ্রিয়, ফূর্তিবাজ। বুঝতেই পারেনি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি সেনাবাহিনীও। নইলে বাইরে থেকে আসা ছোট ছোট উপজাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত না? রুখে দিতে পারত না সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান? আসলে জান মা– পাপ-পুণ্য বোধ যখন লুপ্ত হয় তখন বোধহয় এভাবেই ভেঙে পড়ে সমাজ-সভ্যতা।' মা অবাক-মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েছিল একরোখা-মুখচোরা মেয়েটার দিকে। টেলিফোনটা কয়েকবার বেজে বন্ধ হয়ে গেছে। অরিজিৎ বা মা কে জানে কে ফোন করেছিল। তিতিরটাও যে কোথায় যায়! বাইরে ঝড়ের তান্ডব বাড়ছে আরও। বুড়ো অরবিন্দর চেয়ার দিয়ে দরজা আটকানো দেখে হাসি পাচ্ছিল অনন্যার। দুটো কাঠের চেয়ার দিয়ে প্রকৃতিকে রুখবে! একেই বলে ভীমরতি। ইতিহাসের অধ্যাপক অরবিন্দ তো ছিল অনন্যার মাস্টারমশাই। পি. এইচ. ডি করার সময়ই তো আলাপ হল প্রবীরের সাথে। কি তীক্ষ্ণ চেহারা ছিল, আর বুদ্ধিমত্তা! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অজান্তে। বাইরের বৃষ্টি আরও তীব্র। দরজার তলা দিয়ে, জানলার ধার দিয়ে জল নামছে প্রবল। জল না কি অশ্রু! দাঁতে দাঁত চেপে বড় করতে হবে তিতিরকে। করতেই হবে। তবেই তো মা হওয়ার সার্থকতা। কিন্তু তিতিরটা যে কোথায় গেল? একটা অস্বস্তি পেয়ে বসতে শুরু করে। যেমন অস্বস্তি টিকটিকির মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। অস্বস্তির বিকল্প বুঝি বা মেনে নেওয়া! আপাতত: অস্বস্তি সরিয়ে অনন্যা এগোল তিতিরকে খুঁজতে। বাজ পড়ল আবার। না ভয় পায়নি সে, ভয় পেলে বাঁচবে কি করে? হাঁক মারল– 'তিতির!'

ধৈর্যশীল হও। অপরের প্রতি সম্ভ্রমশীল হও। অনুভূতিসম্পন্ন হও। আমি তোমাদের এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দেব, যে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। অতএব, জাগ্রত হও।

আট বছরের তিতির এমনপা টিপে টিপে চলে এসেছে বাড়ির পিছন দিকে। গায়ে রেনকোট। চারদিক ঝাপসা হলেও তিতিরের কোনো অসুবিধা নেই। ও এখন কটেজের পেছনের আউটহাউসের বাথরুমে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সেকানে চটের ওপর পলিথিন। তার ওপর বিট্টু। তিতিরকে দেখেই মুখ ঘষতে লাগল পায়ে। হ্যাঁ, পকেট থেকে গুণে গুণে আটটা বিস্কুট বার করল সে। বিস্কুটগুলো প্লাস্টিকে মোড়ানো ছিল। এখন তিতির ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছে। আর বিট্টু পা দুটো উঁচু করে তিতিরের বুকের কাছে। কুঁই কুঁই শব্দ করছে সেও। বাজ পড়ল

আবার, তিতির জড়িয়ে ধরল বিট্টুকে। না ও ভয় পায়নি। ওর ভয় করেই না। ফাঁকা বাড়িতেও তো কদিন একাই কাটে ওর। কিসের ভয়। খুব বেশি ভয় করলে চিৎকার করে গায়– জেসাস লাভস মি দিস আই নো, অ্যাজ দি বাইবেল সেজ মি সো। স্কুলের রেবেকা আন্টির কাছে শিখেছে গানটা। আন্টি বলেছিল– যীশু বাবাকে মন দিয়ে ডাকলে তিনি পাশে এসে দাঁড়ান। সাথে থাকেন। তো ভয় কিসের? বাবা ওকে ভালোবাসে কখনো মনে হয় কখনো মনে হয় না। যাবেই বা কেন? প্রীতমের দাদু লজেন্স দেয়, ক্যাডবেরী দেয়, মোহনের দাদু তো একটা অ্যাকুয়ারিয়াম কিনে দিয়েছে, আর আলিশার দাদু কিনে দিয়েছে একটা লেডি বার্ড সাইকেল। আলিশা বাটারফ্লাইয়ের মতো উড়তে উড়তে সাইকেলটা নিয়ে স্কুলে আসে। ও মাম্মিকে বলেছিল। মাম্মি বলেছে– লোভ করতে নেই, আর দাদুকে নিয়ে ওরকম বলতেও নেই। তাই ও এখন আর বলে না। মাঝে মাঝে মনটা খুব খারাপ হয়। তখন কাঁদে, আর চোখের জল দিয়ে লেখে– জেসাস আই লাভ ইউ। বিট্টু ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। মাম্মি ইউ আর মাই মাদার মেরী। মাম্মি ওকে খুব ভালোবাসে। আবার বকেও। তখন ও ছবি আঁকে একমনে...

ওই ডাক পড়েছে। মা খুঁজছে। তিতির একচুটে পালালো। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে চুপ করে নিজের পড়ার টেবিলে হোমটাস্ক নিয়ে বসল। হিস্ট্রি লিখতে হবে। হোয়াই ইজ সিভিলাইজেশন? আবার বাজ পড়ল। দাদু এখন ডাইনিং-এ ঢুকছে। ও মাথা নীচু করে বইয়ে মন দিল। ও কিন্তু দাদুকে খারাপ বাসে না। আফটার অল দাদু তো!

> সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাবে। পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হইবে। ভয়ে ভূমন্ডলে যাহা ঘটিবে তাহার আশঙ্কায় মানুষের প্রাণ উড়িয়া যাইবে কেননা আকাশ মন্ডলের পরাক্রমে সকলে বিচলিত হলে।

অরবিন্দ পায়চারি করছিল ডাইনিং হলে। আর বিড় বিড় করছিল অ্যাপোক্যালিপ্স। পাপে যখন ভরে ওঠে পৃথিবী তখনই আসে অ্যাপোক্যালিপ্স। আসতেই হয়। ডাইনিং টেলির পাশে চেয়ার টেনে বসল অরবিন্দ। কিছুটা অসহায়। বাইরের দরজায় কে যেন আওয়াজ করছে। অ্যাপোক্যালিপ্স? বৃষ্টি বাড়ল আবারও। কারেন্ট চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। প্রবীরও মাথা চুলকোতে চুলকোতে ডাইনিং হলে। ও এতক্ষণ পড়ছিল মায়া সিভিলাইজেশনের কথা। মেক্সিকো, এন. সালভাদোর, হনডুরাস, গুয়াতেমালা...কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগেই ওখানে ছিল এক উন্নত সভ্যতা, যারা শিল্প-কলা, অর্থনীতি-সাহিত্য, স্থাপত্যে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল। ওদের ছিল নিজস্ব লিপি। যা খোদাই করা আছে পাথরের গায়ে। ওদের ছিল নিজেদের দিন-পঞ্জিকা। মায়া ক্যালেন্ডার। ওদের ছিল জ্যোতির্বিদ, যারা ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ওরা জানিয়েছিলেন অ্যাপোক্যালিপ্স-এর কথা। সভ্যতার ধ্বংসের ভবিষ্যৎ বর্ণনা। এক চরমতম দুর্যোগে... একুশ তারিখ, একুশে ডিসেম্বর সেই তারিখ। আজই তো একুশ! বাজ পড়ল আবার...ডাইনিং টেবিলে বাবার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল প্রবীর। বাইরে দরজায় কে যেন টোকা মারছে... তবে কি? অনন্যা তখন ঘরে ঘরে জ্বেলে দিচ্ছিল বাতি। নিভে যাচ্ছে আলো। কারণ বাইরের বাতাসর যে কণিকামাত্র ঘরে প্রবেশ করছে তারও দাপট এতটাই। তিতিরের সামনে আলো দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। কি ছবি আঁকছ তিতির? এ কেমন ছবি! তিতিরের ড্রয়িং খাতায় আঁকা একটা কাঠের ট্রে। ট্রে জুড়ে ছড়ানো আঠা। আর সেই আঠাতে আটকে পড়ে ছটফট করছে তিনটে ইঁদুর। ওপরে লেখা ট্রাবল-গাম– 'এ তো একটা ইঁদুর ধরার যন্ত্র। তুমি দেখলে কোথায়?' তিতির চুপ।

'কেন আঁকছ এসব আজে বাজে ছবি। তোমার ভালো হতে ইচ্ছে করে না?'

খাতাট বন্ধ করে দিল অনন্যা। তিতির চুপ। এতো রিঅ্যাক্ট কেন করল অনন্যা? এবার খারাপ লাগছে ওর। কেমন একটা অস্বস্তিও। তিতির উঠে দাঁড়াল। হতাশ অনন্যা ডাইনিং টেবিলে প্রবীরের মুখোমুখি। অন্যদিকে চেয়ে...বাজ পড়ছে মুর্হুমুহু। তবে কি ঝলসে যাবে সবকিছু। এত জোরে বাতাস বইছে। বৃষ্টি আরও প্রবল... বাইরের দবজায় কে যেন টোকা মারছে... কে? তবে কি? ...ভয় লাগছে... তিতিরেরও কানে এসেছে সে শব্দ...এক..দুই... তিন দরজাটা মুহূর্তে উঠে গিয়ে দিল তিতির...আর ঝড়... জল... বিদ্যুৎ... ঢুকে পড়ল ঝাঁপিয়ে ঘরের ভেতর... টেবিলে মুখোমুখি অরবিন্দ, প্রবীর, অনন্যা...টেবিলের মাঝের চাকতিটা ঘুরতে শুরু করেছে দ্রুত হাওয়ায়... দরজা খোলা... তিতির কি করছ? তিনজনের সমস্বরের চিৎকার এখন স্থির...চাকতি ঘুরছে... এখন তার মার পাশের চেয়ারে বসেছে তিতির... আর তিতিরের গা ঘেঁষে বিট্টু... বিট্টুও চেয়ারে... দরজা হাট করে খোলা... কেউ এগোচ্ছে না সে দরজা বন্ধ করতে... ঘর–বাহির– ঘর এখন মিলেমিশে একাকার। আর তিতির ভয়ডরহীন হয়ে ছবি আঁকার পাতাটা ছিঁড়ে তা ভাঁজ করছে... ধীরে ধীরে। এ ঘরে, এ বাড়িতে এখন আর কোনো আলো জ্বলে নেই। গভীর– গভীরতর অন্ধকার... অনর্গল বিদ্যুতের আলোয় যতদূর দেখা যায়... কেবল তিতির কাগজ ভাঁজ করে কি যেন বানাচ্ছে... পাহাড়ের সমস্ত পথ বেয়ে জল নামছে প্রবল... চাকা ঘুরছে... অরবিন্দ, প্রবীর বিড়বিড় করে বলছে অ্যাপোক্যালিপ্স... অনন্যা আঁকড়ে ধরে আছে তিতিরের হাত, তিতিরের হাটুতে মুখ ঘষছে বিট্টু...

> 'আর তৎকালে প্রবল সে দুর্যোগ পরাক্রমে...
> মহাপ্রতাপে মেঘযোগে দেখতে আসবে
> গভীর সে অন্ধকার ক্ষণ
> মনুষ্যপুত্রের হেটমুন্ড উর্ধ্বপদ।'

চাকাটা বনবন করে ঘুরছে। ঘুরতেই থাকল।

'রোমান', 'গ্রীক', ও 'উনডাস'কে পেছনে রেখে মুখোমুখি অরবিন্দ, প্রবীর, অন্যান্য। ওদের দাঁতে-দাত, নখে নখ। ওরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপে মগ্ন। ওরা খেয়ালই করেনি কখন অজান্তে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অরবিন্দর স্ত্রী সরমা, প্রবীরের নেপালি বস্তির মেয়ে রেশমা, অনন্যার

বন্ধু অরিজিৎ। পারস্পরিক কলহ যখন তীব্র, সে কলহে যোগদান করেছে পেছনের তিনজনও। ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ ও বজ্রে বেসামাল ডাইনিং হলে কখন যেন সে ঘূর্ণায়মান চাকতি থেমে গেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। চাকতির তীর এখন তিতিরের দিকে নির্দিষ্ট।

এমন পিতা কেহ নাই
যে পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর প্রদান করে।
মাছ চাহিলে সর্প প্রদান করিবে।
ডিম চাহিলে বৃশ্চিক প্রদান করিবে।
অতএব যাঞ্চা কর, তোমাদিকগে দেওয়া হইবে।
অন্বেষণ কর, পাইবে
দ্বারে আঘাত কর, তা খুলিয়া দেওয়া হইবে।
দৃষ্টি উর্ধ্ব করো। মাথা উর্ধ্ব করো।
তোমদের মুক্তি সন্নিকট।

অলৌকিক বুঝিবা এসময়েই ঘটে। তিতিরের হাতের ভাঁজে ভাঁজে কাগজ এমন নৌকো। ও নৌকোটাকে টেবিলের ওপর রাখল। টেবিল তো আর টেবিল নয় জল থৈ-থৈ নদী। জল স্পর্শ হওয়ামাত্র সে নৌকো এখন এক বৃহৎ ময়ূরপঙ্খী নাও। তিতিরের হাতে দাঁড়। বিট্টু কখন যে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে সে নৌকোয় কেউ খেয়ালই করেনি। তিতিরের হাত ধরে নৌকোয় উঠল অনন্যা। পাশে দাঁড়িয়ে এক শ্বেত বসন, শুভ্র কেশ প্রবীণ মানুষ যিনি হাল ধরেছেন সে নৌকোর। ডাইনিং টেবিল থেকে নেমে গেট দিয়ে বেরিয়ে সে নৌকো পথ পেল। পাহাড়ি নদী পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলল... প্রবীর সে নৌকোর পেছনে দৌড়চ্ছে কাতর আবেদন সহ, তাকেও যেন ঠাঁই দেওয়া হয় ওই নৌকোতে।

গভীর, গভীরতর রাত হয়ে এলে
জেগে থাকে কেউ
হয়তো আলোও জ্বালে সে।

২১সে ডিসেম্বর, শুক্রবার মধ্যরাত অতিক্রম করে সে নৌকো এগিয়ে চলল। জলমগ্ন চরাচর ছেড়ে কোনো একটুকরো স্থলভাগের উদ্দেশ্যে। সামনে দীর্গ পথ। বলা হয়নি, বৃহৎ সে ময়ূরপঙ্খীতে ঠাঁই হয়নি প্রবীণ জ্ঞান তাপস (!) অরবিন্দর। যদিও আবহাওয়ার এ সম্ভাব্য কঠিন পরিবর্তনের কথা তিনি আগেই জানতেন।